আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী -২

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

প্রথম পর্বের পর হতে...

গ্যালিলিওর কথা শুরু করার আগে প্রথমে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের ব্যাপারে সে সময়কার জ্যোতির্বিদদের ধ্যান-ধারণাগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আসলে পৃথিবী যে গোল এবং গতিশীল, এই ধারণায় পৌঁছাতেই মানুষের সময় লেগেছে বহুদিন। প্রাচীন কালের সাহিত্য আর ধর্মগ্রন্থ গুলো পড়লে বোঝা যায়, সে সময়র মানুষেরা শুধু পৃথিবীকে শুধু সমতলই ভাবত না, ভাবত গতিহীন - স্থির! ভাবত সারা আকাশ এই স্থির পৃথিবীর চারিদিকে ২৪ ঘন্টায় পাক খেয়ে চলেছে। এমনকি থেলসের (৬২৪ -৫৩৭ খ্রী.পূ) মত প্রথিতঃযশা গ্রীক বিজ্ঞানী পর্যন্ত ভাবতেন, পৃথিবী দেখতে অনেকটা সমতল চাকতির মত - জলাদির উপরে ভাসমান কর্ক খন্ড যেন! তবে মানুষ ধীরে ধীরে তার ভুল ধারণা পালটাতে পেরেছে; পেরেছে মহাকাশ নিয়ে তার অনন্ত কৌতুহল আর পর্যবেক্ষণশক্তির কারণেই । যেমন, খুব সহজেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝেছে ক্যানোপাস (Canopus) নামে উজ্জ্বল যে তারাটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দৃশ্যমান, তা কিন্তু এথেনস থেকে মোটেই দেখা যায় না, দিগন্তরেখার উপরে না আসবার কারণে। আবার চন্দ্রগ্রহণের সময় মানুষ খেয়াল করে দেখেছে, চাঁদের উপরে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তা গোলাকার। এভাবে বিভিন্ন ধরণের পরোক্ষ প্রমাণ পেয়ে 'সমতল পৃথিবীর ভূত' মাথা থেকে অবশেষে সরাতে পেরেছে। তবে গ্রীক দার্শনিকরা সৌরজগতের কেন্দ্রে বসে থাকা 'আপোষহীন পৃথিবীকে' ক্যু করে তখনও নামাতে পারেনি।

আটলাসের কাঁধে বিশ্বব্রহ্মান্ড। পৃথিবী এর কেন্দ্রে।

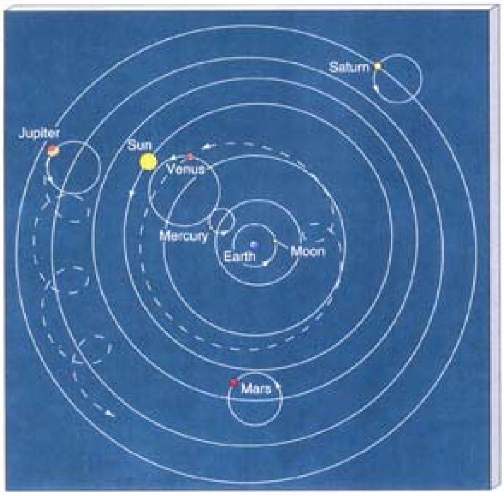

টলেমীর মডেলের একটি সরলীকৃত রূপ

আসলে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত গ্রীক দার্শনিকদের গুরু অ্যারিস্টটল আর আর গ্রীক-মিশরীয় গনিতবিদ টলেমীর (যিনি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস

করতেন) ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) মতবাদ পৃথিবীবাসীকে দৃশ্যত সম্মোহিত করে রেখেছিল। দু' জনেই বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্থির আর অবস্থান করছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে সূর্য, চন্দ্র আর অন্যান্য নক্ষত্ররাজি। এই মতবাদ অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রী.পূ) পূর্বে প্লেটোও তার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। এদের সবারই ধারণা ছিল যে, সূর্য, চন্দ্র সহ সকল মহাজাগতিক বস্তু একটি বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করছে। এ ধরণের ধারণা সূর্য আর চাঁদের গতিপথের ক্ষেত্রে একধরণের ' আপাতঃ সন্তোষজনক' ফলাফল দিলেও গ্রহাদির ঔজ্জ্বল্য আর তাদের অধোগতি কিন্তু কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। প্রয়োজন পড়ল আরেকটু জটিল মডেলের। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমী ১৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ' ভূ-কেন্দ্রিক মডেলের একটি নক্সা প্রণয়ন করলেন। কোপার্নিকাস রংগমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত টলেমীর এই ভুল মডেলটি প্রায় তের শতক ধরে অবলীলায় জন-মানসে রাজত্ব করেছে 'সঠিক মতবাদ' হিসেবে; কারণ সাদা চোখে পাওয়া নিত্যদিনকার 'এভিডেনসের' সাথে টলেমীর মতবাদের কোন আপাতঃ বিরোধ ছিল না।

একটু ভুল হল। কোপার্নিকাসের আগে কেউ যে এই ভূ-কেন্দ্রিক মডেলে কখনও সন্দেহ পোষণ করেনি এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন, গ্রীক জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টাকাসের কথা বলা যায়। অ্যারিস্টাকাস (৩১০-২৩০ খ্রী পূঃ) অত্যন্ত সাহসের সাথে অ্যারিস্টটলের মতবাদকে অস্বীকার করে সে সময় বলেছিলেন পৃথিবী এক বছরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। তিনি এমনকি পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর 'আহ্নিক গতি'র কথাও বলেছিলেন। আকাশ-মন্ডলী আর গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল সম্পর্কিত বহু অনুমানই পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হলেও তখনকার সময়ে তাঁর মতবাদ মোটেও জনগণের কাছে সমাদৃত হয় নি। এর কারণও ছিল। অ্যারিস্টাকাস তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কোন গানিতিক প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। আর তা ছাড়া অ্যারিস্টটল ছিলেন সে সময়কার 'মহানবী'। সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল বিশাল, অনুরাগীর সংখ্যাও ছিল বিপুল। অ্যারিস্টটলের বানী সমাজে গৃহীত হত প্রায় 'ঈশ্বরের বাণী' হিসেবে! অ্যারিস্টটলের জনপ্রিয় মতবাদের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে অ্যারিস্টাকাসের 'সূর্যকেন্দ্রিক' (Heliocentric) মতবাদ খড়-কুটোর মতই ভেসে গেল।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

এই রকম আবস্থা চলছিল প্রায় চৌদ্দ শতক পর্যন্ত যখন প্রথমবারের মত টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ প্রবলভাবে বাঁধার সম্মুখিন হল Mikolaj Kopernic (1473-1543) নামে এক পোলিশ যাজকের কাছ থেকে, যিনি পরবর্তী জীবনে Nicholas Copernicus নামে জনপ্রিয় হন। তাঁর পেশাগত জীবনের শুরুতেই তিনি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং বুঝতে পারেন টলেমীর মডেলের অনেক সমস্যাই খুব সহজে সমাধান করা যায় যদি পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সূর্যকে বসানো যায়। পৃথিবী যে সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, বরং অন্যান্য গ্রহদের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণরত একটি গ্রহমাত্র - মানব সমাজে এই চিন্তা-চেতনার উত্তোরণকে এখন অভিহিত করা হয়

‘কোপার্নিকাসীয় বিপ্লব’ (Copernician Revolution) হিসেবে।

কোপার্নিকাস কিন্তু তার বিখ্যাত বইটি (De Revolutionibus Orbium Celestum) ১৫৩০ সালে লিখে ফেলার পরও অনেকদিন ধরে ছাপাতে চাননি। কারণ কোপার্নিকাস বুঝতে পেরেছিলেন যে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে ফেলায় ‘পৃথিবীর বিশিষ্টতা’ যে ক্ষুন্ন হয়েছে তা ধর্মবাদীরা সহজ ভাবে মেনে নেবে না। কোপার্নিকাসের ভয় অমূলক ছিল না। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাসের বইটি যখন বাজারে বেরোয়, তখন প্রকাশক কোপার্নিকাসের আনুমতি না নিয়েই একটি লাইন যোগ করে দেন এই বলে যে বইয়ের মতবাদটিকে যেন আক্ষরিক ভাবে না নেওয়া হয় - বরং শুধুমাত্র বিচার করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি পরিমাপের সহায়ক একটি পদ্ধতি হিসেবে!

কোপার্নিকাসের বইটি বেরোবার পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই বইটি পাঠকসমাজে ‘অনাদৃতই’ থেকে গেল। এই বইয়ের তেমন কোন প্রভাবই তখন জনগনের উপর পরেনি। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত বইটির ‘Radical claim’ এবং কারিগরি জটিলতা। আর একটি কারণ ছিল কোপার্নিকাস তাঁর বইটি লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন ভাষা তখন শুধু শিক্ষিত জনগোষ্ঠির একাংশের মধ্যে কেতাবী আলোচনার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষেরা এই বইটির স্বাদ থেকে ছিল বঞ্চিত। আসলে কোপার্নিকাসের এই বইটি জনপ্রিয় হয় তার মৃত্যুর আনেক পরে গ্যালিলিওর কল্যাণে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ সে সময়ই কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের বিবেচনায় আনেন এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বইয়ের তালিকায় এটিকে লিপিবদ্ধ করেন। পাঠকেরা শুনলে অবাক হবেন যে, কোপার্নিকাসের এই বইটি ‘নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায়’ (Index of Prohibited books) উঠেছিল ১৬১৬ সালে - বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় ৭৩ বছর পর। আর সেই তালিকায় সেভাবেই ছিল আঠার শতক পর্যন্ত।

গ্যালিলিও র রাজত্বকাল ছিল ১৫৬৪-১৬৪২। রাজত্ব ছাড়া আর কিই বা বলা যায় তাকে! রাজার মতই ছিল তার বিচরণ, যদিও পেশায় ছিলেন গনিতের অধ্যাপক। পড়াতেন পাদুয়া আর পিসায়। কোত্থেকে শুনলেন যে, টেলিসকোপ নামে একটি যন্ত্র কে যেন আবিস্কার করেছে যা দিয়ে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র খুব বড় করে দেখা যায়। ব্যাস শোনা মাত্রই (স্রেফ শোনা, দেখা কিন্তু নয়) তিনি নিজেই লেগে গেলেন নিজের জন্য একটা টেলিসকোপ বানাতে। বানিয়েও ফেললেন অবশেষে। এই টেলিসকোপ দিয়েই তিনি চাঁদের পাহাড় দেখলেন, বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখলেন। আর সৌর কলঙ্ক আবিস্কার করলেন

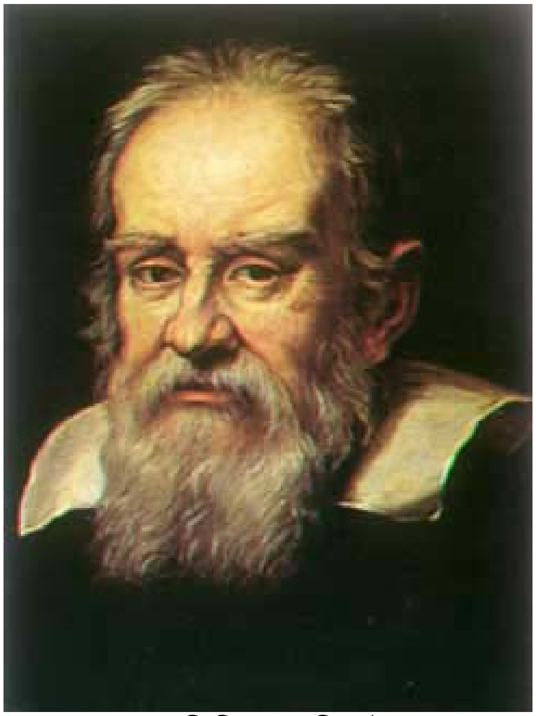

গ্যালিলিও গ্যালিলাই

(সরাসরি এভাবে সূর্যের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকায় শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন গ্যালিলিও)। তাকে সবচেয়ে অবাক করল শুক্র গ্রহের চাল চলন। তিনি লক্ষ্য করলেন শুক্র গ্রহ ও আমাদের চাঁদের মতই একটি পূর্ণ চক্রাকাল অতিবাহিত করে, যা কিনা এক ভাবেই শুধু ব্যাখ্যা করা যায় - সূর্য যদি এই সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে। এছাড়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলি যে ভাবে বৃহস্পতির চারিদিকে ঘোরে, তাতে তিনি পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন যে, পৃথিবী এই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়। মূলতঃ তার এই পর্যবেক্ষনগুলোই পরবর্তীতে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করে।

গ্যালিলিও তার এই পর্যবেক্ষনগুলো ১৬১০ সালে Sidereus Nuncius (The Starry messenger) নামের একটি বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই বইয়ের 'বিতর্কিত' সিদ্ধান্তগুলো আসলে ছিল কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বেরই পরোক্ষ সমর্থন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে টেলিসকোপের মাধ্যমে পাওয়া তার পর্যবেক্ষণ গুলোর মাধ্যমে গ্যালিলিও আসলে সেসময়কার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন।

জিওর্দানো ব্রুনো

আক্ষরিক অর্থেই তিনি তখন 'আগুন নিয়ে' খেলছিলেন। নিসন্দেহে তিনি আগুন নিয়ে খেলার ভয়াবহ পরিনাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ক'বছর আগেই ১৬০০ সালে জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে রোমে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করার 'অপরাধে' জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ব্রুনোকে আগুনে পোড়ানোর আগ পর্যন্ত চার্চ থেকে চাপাচাপি করা হয়েছিল যেন তিনি কোপার্নিকাসের ভুল মবাদ পরিত্যাগ করে বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপুর্ণ টলেমীর 'পৃথিবী কেন্দ্রিক' মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেন।

বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অবিচল ব্রুনো ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। বরং বিচারকদের দিকে তাকিয়ে অবিচলচিত্তে ব্রুনো উচ্চারণ করলেন - 'Perhaps you, my judges, pronounce this sentence against me with greater fear than I receive it." বোঝাই যায়, ব্রুনোর নশ্বর দেহ যখন আগুনের লালচে উত্তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, 'ধর্ম বেঁচে গেল' ভেবে ধর্মবাদীরা কি উদ্বাহু নৃত্যই না করেছিল সেদিন! তারপরও ঈশ্বর আর তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা শেষ পর্যন্ত থামাতে পেরেছিলেন?

যাহোক, গ্যালিলিও খুব উৎসাহ ভরেই তার নতুন আবিস্কারের কথা চারিদিকে প্রচার করতে শুরু করলেন, যা কিনা হয়েছিল তাঁর অ্যারিস্টটলীয় সহকর্মীদের গাত্রদাহের কারণ। অবশেষে ১৬১৬ সালে তার মতবাদকে ‘ধর্মবিরুদ্ধ’ (heretical) হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়, কোপার্নিকাসের পূর্ববর্তী সমস্ত অবদানকে ‘নিষিদ্ধ’ করা হয়, এবং গ্যালিলিও কে তার বিশ্বতত্ত্বের প্রচার থেকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়।

গ্যালিলিও কিন্তু বসে ছিলেন না। এসময় গ্যালিলিওর পুরোন বন্ধু এবং তাঁর অনুরাগী Maffeo Barberini নির্বাচিত হন Pope Urban VIII হিসেবে। ফলে গ্যালিলিও আবার তাঁর বিশ্বতত্ত্ব প্রচারে উৎসাহিত হয়ে পরেন। অবশেষে ১৬৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টলেমী আর কোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে গ্যালিলিও Dialogue Concerning the Two Chief Systems of the World - Ptolemaic and Copernican নামে তাঁর বিখ্যাত বইটি প্রকাশ করেন।

সাধারণ জনগণের কথা মনে রেখে বইটি লেখা হয়েছিল ইতালীয় ভাষায় - খুবই আকর্ষনীয় ভাবে, গ্যালিলিও সৃষ্ট তিন কাল্পনিক চরিত্রের নিজেদের মধ্যে কথোপকথোনের ভিত্তিতে। এই তিন চরিত্রের একজন ছিলেন কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রবল সমর্থক - নাম সালভিয়াতি, আরেকজন অ্যারিষ্টটলীয় দার্শনিক যিনি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্বের সমর্থক - নাম সিম্প্লিসিও, আর তৃতীয়জন (সাগ্রেদো) মোটামুটি নিরপেক্ষ। বইটিতে গ্যালিলিও তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতি প্রবল অনুরাগ কিন্তু ঢেকে রাখতে পারেন নি ।

Dialogue Concerning the Two Chief Systems of the World - Ptolemaic and Copernican

ফলে বইটির ছত্রে ছত্রে দেখা যায় কোপার্নিকাসের সমর্থক চরিত্রটির তুখোর যুক্তির কাছে ‘নির্বোধ’ অ্যারিস্টটলীয় দার্শনিকটিকে বার বার নাজেহাল হতে। ফলে বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে আক্ষরিক অর্থেই পৌঁছেছিল সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের পক্ষে গ্যালিলিওর একটি কৌশলী প্রচারণা হিসেবে।

এই বইটির মাধ্যমে গ্যালিলিও চার্চের সাথে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। ১৬৩৩ সালে চার্চ তাকে পুনরায় অভিযুক্ত করল ‘ধর্মদ্রোহিতার’ আভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে নুজ। এই অসুস্থ বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে টেনে হিচড়ে ফ্লোরেনস থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হল, হাটু মুড়ে সবার সামনে বসে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে বাধ্য করা হল এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্ম বিরোধী, ভুল, মিথ্যা। বাইবেল যা বলছে সেটাই আসলে সঠিক - পৃথিবী স্থির অনড় -সৌরজগতের

কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন - 'তার পরও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে!' 'ধর্মদ্রোহিতার' আভিযোগ মাথায় নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে অন্তরীণ অবস্থায়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বুদ্ধিহীন উগ্র ধর্মবাদীদের দল প্রতিটি যুগেই ক্ষমতার শীর্ষে থেকে গেল প্রগতির চাকাকে উলটো দিকে ঘোরাতে।

১৯৯২ সালের ৩১ এ অকটোবর। গ্যালেলিওর মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর পোপ জন পল-২ ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য দিয়ে স্বীকার করে নিলেন যে গ্যালিলিওর প্রতি চার্চের সেসময়কার আচরণ মোটেই সঠিক ছিল না।

৩য় পর্ব...